দেশ-বিদেশের বিচিত্র আলাপন-৩৫

খন্দকার জাহিদ হাসান

এক অর্ধ-সুন্দরী ও বরফ যুগের যুবকের গল্প

[ব্যাপারটা পছন্দ হল না তৃষা চৌধুরীর। 'বরফ যুগ' থেকে ধরে নিয়ে আসা যুবা পুরুষটার ভার শেষ পর্যন্ত তার ঘাড়েই চাপানো হল। চৌদ্দ হাজার বছর আগেকার এই মানুষটিকে শিখিয়ে-পড়িয়ে একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী করে তুলতে হবে। তৃষা ছিল 'টাইম মেশিন প্রজেক্ট' টীমের একজন সাধারণ সদস্যা। টীম লীডার ডক্টর আল্‌ফাজ হোসেনকে এ-ব্যাপারে সে তার মনঃক্ষুণ্ণতার কথা সরাসরি মৌখিকভাবেই জানাল।]

তৃষাঃ স্যার, এত জনের ভেতর থেকে বেছে বেছে বরফ যুগের ঐ গন্ডমূর্খটাকেই শেষ পর্যন্ত আমাকে গছানো হল? ওর বদলে অন্য কেউ হলে আমার জন্য ভাল হত।

ড. হোসেনঃ (ভ্রূ কুঁচ্‌কে) অন্য কেউ! যেমন?

তৃষাঃ আপনি তো জানেন যে, নাচের ব্যাপারে আমার একটা আগ্রহ আছে। তাই স্যার, মুঘল আমলের নর্তকী মেয়েটির দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হলে খুব খুশী হতাম। আর তা ছাড়া...

ড. হোঃ তুমি কি সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারের নর্তকী ফারিদার কথা বল্‌ছ?

তৃষাঃ ঠিক তাই স্যার।

ড. হোঃ তৃষা, টীমের উচ্চ পর্যায়ের সদস্যদের বিশেষ বৈঠকে অনেক শলা-পরামর্শের পরেই যার যার দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে। অতীতের বিভিন্ন যুগ থেকে নিয়ে আসা মানুষদের প্রাথমিক ভাষা শেখানোর কাজ শেষ হয়েছে। এক্ষেত্রে আমাদের ভাষা শিক্ষকেরা সফল হয়েছেন। এখন তোমাদের দায়িত্ব হবে বর্তমান আধুনিক যুগের জীবনাচরণ আর প্রযুক্তি সম্বন্ধে তাদেরকে মোটামুটিভাবে অবগত করা, অভ্যস্থ করে তোলা। (সামান্য ভেবে নিয়ে) আরেকটা কথা। তোমরা সবাই তো জানোই যে, বিভিন্ন যুগ থেকে ধরে নিয়ে আসা এই মানুষগুলি আমাদের এই আধুনিক জীবনযাত্রার সাথে পরিচিত হওয়ার পর, ওদের মধ্যে কেউ যদি আবার স্বেচ্ছায় তাদের নিজেদের সময়কালে ফিরে যেতে চায়, তাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। সেইজন্যই বল্‌ছিঃ তাদেরকে এখনই কোনো বিষয়ে পারদর্শী করার কোনো দরকার নেই।

তৃষাঃ ও-সব জানি স্যার। আমি শুধু বল্‌ছিলাম কি যে, বরফ যুগের মানুষটা একেবারে হাঁদারাম। ওকে নিয়ে না জানি কি সমস্যায় পড়ি!

ড. হোঃ (স্থির দৃষ্টিতে তৃষার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে) কে বলেছে কানা জোমন হাঁদারাম?

[ড. হোসেনের অসাধারণ স্মৃতিশক্তির কথা তৃষা জানত। তবু বরফ যুগের লোকটার নামও তাঁর মনে আছে দেখে সত্যিই সে অবাক হল। ডক্টর আবার মুখ খুল্‌লেন।]

ড. হোসেনঃ তুমি কি জানো তৃষা যে, কানা তার সময়ের একজন ভাস্কর ছিল?

তৃষাঃ ভাস্কর নয় স্যার, ও ছিল একজন সাধারণ মৃৎশিল্পী। আবার 'কুম্ভকার' বা 'কুমোর'-ও বলা যায়।

[ড. আল্‌ফাজ হোসেন 'তৃষা' নামের কুড়ি বছর বয়সী এই কুমারী মেয়েটার স্পর্ধা দেখে একটু অবাক হলেন। অবশ্য তৃষা সম্বন্ধে আগে থেকেই তাঁর কিছুটা ধারণা ছিল। কিন্তু মেয়েটা যে তাঁর সাথে এভাবে মুখেমুখে তর্ক করতে পারে, তা তিনি ভাবতেও পারেননি। যাই হোক, এখন কোনোভাবেই তাঁর উত্তেজিত হওয়া চলবে না। এই অলাভজনক প্রকল্পটির বিরাট দায়িত্বভার আজ তাঁর কাঁধে। তা ছাড়া, ঠান্ডা মাথায় সবার কাছ থেকে সুন্দরভাবে কাজ আদায় করিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে ডঃ হোসেনের সুনাম রয়েছে। সুতরাং তিনি তাঁর রাগটা সামলালেন।]

ড. হোসেনঃ তৃষা, তুমি ভুল করছ। বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষায় কানা খুব ভাল করেছে। ওর নিজের সেই প্রাচীন মাতৃভাষা তার নখদর্পনে বলে আমার কাছে রিপোর্ট এসেছে। আমাদের বাংলা ভাষা শেখার ক্ষেত্রেও কানা সবচেয়ে ভাল করেছে। সে আসলেই একজন মেধাবী যুবক। আমার ধারণা, কানার সঙ্গে কাজ করে তুমি আনন্দই পাবে।

[তৃষা নিরুপায় হয়ে ডঃ আল্‌ফাজ হোসেনের কথা মেনে নিল। কিন্তু চাপা অভিমানে তার বুকটা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হল। তার সমস্ত রাগ সেই বরফ যুগের মানুষটার ওপর গিয়ে পড়ল। "ইস্‌, 'ফারিদা' নামের সেই মুঘল আমলের নর্তকী মেয়েটার সাথে যদি আমি কাজ করতে পারতাম, তবে কী মজাটাই না হত! মেয়েটা দেখতে কী সুন্দর, আর ওর নাচের ভঙ্গিমা কতো মনোহর! ফারিদার কাছ থেকে যদি নাচের কিছু দুর্লভ মুদ্রা শিখে নিতে পারতাম!!"— একমনে ভাবছিল তৃষা। ড. আল্‌ফাজ হোসেন আবার তাঁর একঘেঁয়ে বক্তৃতা শুরু করলেন।]

ড. হোঃ ও, ভাল কথা তৃষা। জোমনদের পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে তুমি কিছু পড়াশোনা করেছ কি?

[তৃষা মনে মনে প্রমাদ গুণল। সামান্য এক ব্যক্তিগত আর্জি পেশ করতে এসে উল্টো এ কোন্‌ ঝামেলায় পড়ল সে!]

তৃষাঃ (বিরসমুখে) জ্বী স্যার, করেছি। জোমনদের পূর্বপুরুষেরা আজ থেকে বাইশ হাজার বছর আগে সাইবেরিয়া হতে বর্তমান জাপানের উত্তরাঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করে।

ড. হোঃ হ্যাঁ, বরফ যুগের সেই সময়কালটাতে সাইবেরিয়া থেকে জাপান পর্যন্ত বিশাল এক বরফ-সেতু বিস্তৃত ছিল। সাইবেরিয়ার অকল্পনীয় ঠান্ডায় জোমনরা টিকতে না পেরে সেই সুদীর্ঘ বরফ-সেতু ধরে জাপানের উষ্ণতর ভূ-খন্ডে চলে আসে। আর তোমার মক্কেল এই কানা জোমন তাদেরই এক বংশধর। ব্যাপারটা কত এক্সাইটিং আর থ্রিলিং, তা কি একবার ভেবে দেখেছ?

তৃষাঃ জ্বী স্যার, দেখেছি।

ড. হোঃ (দ্বিগুণ উৎসাহের সাথে) ওদের জীবিকা ছিল প্রধানতঃ শিকার। পরবর্তীকালে ওরা ব্যাপকভাবে মৃৎশিল্পের দিকে ঝুঁকে পড়ে। আর এখন থেকে

তিন হাজার বছর আগে জাপানে আরও একটা সম্প্রদায়ের আগমন ঘটে। এদের নাম 'ইয়াওই'। এরা আসে কোরীয় উপদ্বীপ ও এশিয়ার মূল ভূ-খন্ড থেকে। ইয়াওইরা ছিল কৃষিজীবী এবং চাল উৎপাদনে সিদ্ধহস্ত। জাপান বা নিপ্পনের বর্তমান অধিবাসীরা 'জোমন' ও 'ইয়াওই'— এই দুই ধারার সংমিশ্রণ।

[ড. হোসেনের প্যান্‌প্যানানি যেন আর না বাড়ে, সে ব্যাপারে এবার তৃষা সতর্ক হয়ে পড়ল। আলোচনার ইতি টানার ব্যর্থ এক চেষ্টা করল সে।]

তৃষাঃ ঠিক আছে স্যার। দোয়া রাখবেন। এখন তাহলে আসি?

ড. হোঃ এসো। গুড লাক!... ও হ্যাঁ। ভাল কথা মনে পড়েছে। কানা জোমনকে নিয়ে শুধু একটাই সমস্যা হবে তোমার। ছেলেটার নাকি সব সময় খুব গরম লাগে। সেদিকে একটু খেয়াল রেখো।

তৃষাঃ (বিস্মিত কণ্ঠে) কি বললেন স্যার? এই শীতের মধ্যে ওর গরম লাগে!

ড. হোঃ বাংলাদেশের আবার শীতকাল! জোমন কোথা থেকে এসেছে, তা একবার ভেবে দেখ তো! ওদের ওখানে যে-রকম অকল্পনীয় ঠান্ডা, তাতে এখানে তো ওর গরম লাগারই কথা। শীতকাল তো কি হয়েছে?

[যাই হোক, একরাশ বিরক্তি নিয়ে কাজে নামল তৃষা চৌধুরী। কানা জোমনের সাথে তৃষার প্রথম কথাবার্তা নিম্নরূপ।]

তৃষাঃ কানা, আমাদের বাংলা ভাষায় তোমার নামের মানেটা কি, তা কি তোমার জানা আছে?

কানাঃ হ্যাঁ, আছে।

তৃষাঃ শোনো, আমি তোমার একজন শিক্ষক। আমাকে তোমার 'হ্যাঁ' না বলে 'জ্বী' করে বলা উচিত। বুঝেছ?

কানাঃ জ্বী, বুঝেছি। আপনাকে আমি কি বলে ডাকব?

তৃষাঃ 'ম্যাডাম' বলে ডাকবে।... আচ্ছা, ঠিক আছে। এখন বলোতো, বাংলাতে তোমার নামের মানে কি?

কানাঃ যে চোখে দেখতে পায় না। অবশ্য শব্দটা কথ্য। এর একটা ভাল বাংলা প্রতিশব্দও রয়েছেঃ 'অন্ধ'।

[তৃষা মনে মনে মৃদু একটা ধাক্কা খেল এবং যথারীতি তা সামলেও নিল। সেও কম ঘুঘু মেয়ে নয়!]

তৃষাঃ থাক, তোমার ভাষাজ্ঞান ফলানোর কোনো দরকার নেই। আমাদের হাতে এখন অনেক কাজ!

কানাঃ ইয়ে, তবু জানতে ইচ্ছে করছিল, আপনি কি আমার নামের আসল মানেটা জানেন ম্যাডাম?

[তৃষা বলতে যাচ্ছিলঃ 'আসল মানে জানারও কোনো দরকার নেই!' কিন্তু তার মুখ ফস্‌কাল।]

তৃষাঃ কি-ই-ই, আসল মানেটা?

কানাঃ আমার পুরো নাম 'কানা জোমন'। আমাদের জোমন ভাষায় 'কানা' মানে 'শক্তিশালী' বা 'ক্ষমতাবান'। আর 'জোমন' মানে...

তৃষাঃ (কানার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে) 'জোমন' মানে আমি জানি– 'কুমোর'।
কানাঃ (কিছুটা আহত স্বরে) ঠিক কুমোর নয়। 'জোমন' মানে...
তৃষাঃ (আবারও কানার কথায় বাধা দিয়ে) কানা, ও সব কথা এখন থাক। আজ তোমার আউটডোর ট্রেনিং। পরে ইন্‌ডোর হবে। চলো, এবার তোমাকে হ্যাকিন্টকে চড়িয়ে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে আসি।
কানাঃ ম্যাডাম, এটা কি টাইম মেশিনের মতন আর একটা যানবাহন?
তৃষাঃ হ্যাঁ, হ্যাকিন্টক একটা যানবাহনই বটে। তবে এটা টাইম মেশিনের মতো এক সময় থেকে আরেক সময়ে যেতে পারে না। এটা মাটি থেকে সামান্য ওপর দিয়ে উড়ে উড়ে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে দ্রুত চলে যেতে পারে।

[তৃষা হ্যাকিন্টকের চালকের আসনে বসল। আর কানা বসল তৃষার পাশের আসনটিতে। পেশীবহুল পেটা শরীর তার। এই ঠান্ডার মধ্যেও কানা পরে ছিল শুধু স্যান্ডো গেঞ্জি, হাফপ্যান্ট আর কেড্‌স্। তারপরও সে তৃষাকে সবিনয়ে তার গরম লাগার কথা জানাল। কী আর করা! অগত্যা এয়ার কুলার চালিয়ে দিতে হল। এই সমস্যাটার ব্যাপারে ড. আল্‌ফাজ হোসেন তৃষাকে আগাম জানিয়ে রেখেছিলেন। তাই সে প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। প্রচুর গরম জামা-কাপড়ে নিজেকে ঢেকে রেখেছিল তৃষা। যা হোক, তারা মাটি থেকে একশ' মিটার ওপর দিয়ে উড়ে চলল। পৃথিবীর মাটির দ্বীনতা-নীচতা থেকে কিছুটা ওপরে উঠে যাওয়ার কারণেই হোক, কিংবা তার পাশে বসা প্রাচীন যুগের এই সুপ্রাচীন মানুষটার ভালমানুষির কারণেই হোক, তৃষার মনটা একটু নরম হয়ে পড়েছিল। তার মনের হেঁশেল থেকে অভিমানের ছুঁচোটা যেন ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। হ্যাকিন্টকের অডিও প্লেয়ারে রবীন্দ্র সঙ্গীতের একটা সি.ডি. আস্তে করে চালিয়ে দিল তৃষা। গান বাজতে শুরু করলঃ

"সকাতরে ঐ কাঁদিছে সকলে
শোনো শোনো পিতা,
কহো কানে কানে
শোনাও প্রাণে প্রাণে
মঙ্গল বারতা॥"

গান শেষ হলে কানাই প্রথম মুখ খুলল।]

কানাঃ বাহ্‌, চমৎকার গানটা তো!
তৃষাঃ হ্যাঁ। এটা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান।
কানাঃ উনার নাম শুনেছি। তবে আমি তো এখনও খুব একটা ভাল বাংলা শিখিনি। তাই এই গানের কথার মানেও আমি ঠিকমতো বুঝতে পারিনি। শব্দগুলো বেশ কঠিন। তবে সুর শুনে মনে হয়, এটা একটা দুঃখের গান। এই গানটা কি আপনার গাওয়া?
[তৃষার মনে হল, লোকটা তার সঙ্গে রসিকতা করছে। অভিমানের সেই ছুঁচোটা মনে হয় সুড়ুৎ করে আবার ফিরে এল।]
তৃষাঃ ডক্টর হোসেন বলছিলেন, তোমার বুদ্ধিমত্তা নাকি অসাধারণ। এখন দেখছি উনি ভুল বলেছেন।
[কানাকে বেশ বিষণ্ণ দেখাল। সে কি বলবে, তা ভেবে পাচ্ছিল না। তবু কিছু বলার চেষ্টা করল।]

কানাঃ আমি দুঃখিত ম্যাডাম! তবে, ইয়ে... ,মানুষের কথা বলার গলার সঙ্গে তার গান গাওয়ার গলার কি সব সময় খুব একটা মিল থাকে?

তৃষাঃ তা থাকে না। তাই বলে কি কারণে হঠাৎ তোমার মনে হল যে, এটা আমার গাওয়া গান?

কানাঃ (কিছুক্ষণ নীরবতার পর) এমনটি মনে হওয়ার কারণ হলঃ গানটার চেহারার সাথে আপনার চেহারার খুব মিল রয়েছে।

তৃষাঃ গানের আবার কোনো চেহারা হয় নাকি? তোমার মাথা খারাপ!

কানাঃ অবশ্যই গানের চেহারা হয়। প্রতিটি গানের আলাদা আলাদা চেহারা থাকে।

তৃষাঃ এ তোমার মস্ত ভুল কানা। এই গানটা রবি ঠাকুরের অসাধারণ একটা গান। এটার সাথে আমার চেহারার মিল খুঁজে পাওয়া স্রেফ পাগলামি!

কানাঃ জ্বীনা ম্যাডাম। আমি পাগলামি করছি না। আমি কখনো কোনোকিছু বাড়িয়ে বলি না।

[কানার দৃঢ় অথচ নিরুত্তাপ কণ্ঠে তৃষা কোনো তোষামোদী বা চাটুকারিতার গন্ধ খুঁজে পেল না। কথাগুলি যেন ছিল তার সহজ সরল মন্তব্য। বেশ অবাক হল তৃষা। তবু সে ব্যাপারটা মেনে নিতে পারল না।]

তৃষাঃ কানা, আমি একজন সাধারণ চেহারার মেয়ে। সবাই আমাকে অর্ধ-সুন্দরী বলে মনে করে।

কানাঃ অর্ধ-সুন্দরী!?

তৃষাঃ হ্যাঁ, অর্ধ-সুন্দরী। তুমি এর মানেটা জানো কি?

কানাঃ জ্বী, জানি। তবে এটা একটা ভুল ধারণা। ম্যাডাম, আমি একজন ভাস্কর। জীবনে অসংখ্য নারীমূর্ত্তি গড়েছি। আপনি জোমনদের দেবী বেন্‌যাই-তেন্‌-এর মতোই সুন্দর ও পবিত্র।

[তৃষা বেশ টের পায় যে, কানা জোমন খুব সততার সাথে মন্তব্য করছে। সে তার বক্তব্যে অটল। তৃষার কৌতূহল বেড়ে যায়।]

তৃষাঃ কে এই দেবী?

কানাঃ বেন্‌যাই-তেন্‌ হলেন প্রেম, কবিতা, সঙ্গীত, শিল্প ও সৌভাগ্যের দেবী।

[তৃষা চৌধুরী খুবই অজানা ধরনের এক আবেগের তোড়ে নির্বাক হয়ে যায়। নীচের মাটিতে মানুষের যতো হীনতা আর নীচতা। ওপরে হ্যাকিন্টক উড়ে চলে। পাশাপাশি বসে দু'জন মানব-মানবী– একুশ শতকের এক অর্ধ-সুন্দরী এবং চৌদ্দ হাজার বছর পূর্বের বরফ যুগের এক সুঠামদেহী যুবা পুরুষ।] (কল্পকাহিনীঃ চলবে...)

লেখক পরিচিতি দেখতে এখানে টোকা মারুন এবং
তার আগের লেখাগুলো দেখতে এখানে টোকামরুন